বারো ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিতে চার ইমাম (আবু হানিফা, মালেক, শাফে‘ঈ ও আহমাদ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ: চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ* [১৫০হিঃ-২০৪হিঃ]

বংশ পরিচয়: তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস ইবন আল-আব্বাস ইবন ওসমান ইবন শাফে’ ইবন আস-সায়েব ইবন উবাইদ ইবন আবদ ইয়াযীদ ইবন হাশেম ইবন আল-মুত্তালিব ইবন আবদে মানাফ। এই আবদে মানাফ হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরদাদা। আর শাফে’ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন। শাফে’র পিতা আস-সায়েব বদরের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মাতা ছিলেন ইয়েমেনের আয্দ কবিলার মেয়ে। জন্মগতভাবে এ মহিলা অনেক বুদ্ধিমতি ছিলেন।

জন্ম ও শৈশব: যে বছর ইমাম আবু হানীফা মারা যান সে বছর অর্থাৎ হিজরী ১৫০ সালে ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে ইমাম শাফেয়ী জন্মগ্রহণ করেন। গাজা তার পিতৃভূমি ছিল না। বরং তার পিতা ইদ্রিস একটা বিশেষ প্রয়োজনে সপরিবারে গাজায় যান। সেখানেই তার ছেলে মুহাম্মদের জন্ম হয় এবং তিনি মারা যান। ইমাম শাফেয়ীর বাবা যখন মারা যান তখন তিনি দুই বছরের শিশু। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা তাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। তিনি ইয়েমেনে নিজ কবিলা ‘আয্দের’ কাছে না গিয়ে ছেলেকে নিয়ে মক্কায় যাওয়াটা শ্রেয় মনে করেন। যেন ছেলের বংশ পরিচয় বিস্মৃত না হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়দের জন্য যে অংশ বরাদ্দ থাকে তা থেকেও যেন তার ছেলে বঞ্চিত না হয়। এটাই ছিল এই শিশুর জীবনে প্রথম সফর যার পুরো জীবনটা ইলমী সফরে কাটে।

ইমাম শাফেয়ী মক্কাতে বড় হয়েছেন। উচ্চ বংশীয় মর্যাদা নিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু তাকে জীবন যাপন করতে হয়েছে এতীম ও গরীবদের মত। সম্ভ্রান্ত বংশের যে শিশু গরীবি হালতে জীবন যাপন করে বড় হয় তার মাঝে উন্নত চরিত্র ও উত্তম আখলাক শোভা পায়। বংশ ভাল হওয়ার কারণে তার মানসিকতা থাকে অনেক বড়। আর গরীব হওয়ার কারণে সে মানুষের দুখ-দুর্দশা, সমাজের ভেতরের অবস্থা নিজে অনুভব করতে পারে। যে ব্যক্তি সামাজিক কোনো কাজে ভূমিকা রাখতে চায় তার জন্য এ গুণটি অত্যন্ত জরুরী।

ইলম অর্জন ও ইলমী মর্যাদা: সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। মক্কার বড় ক্বারী ঈসমাইল ইবন কুসতানতিনের কাছে তিনি তাজবীদ শিক্ষা করেন। মক্কার আলেমদের কাছে তিনি তাফসীরের ইলম অর্জন করেন। যারা ‘কুরআনের ভাষ্যকার[1] ও কুরআনের মুফাস্সির’ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইলমের ওয়ারিস ছিলেন। কুরআন মুখস্থ করার পর তিনি হাদীস মুখস্থ করায় মনোযোগী হন।

ছেলেবেলা থেকে তিনি আরবী ভাষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, কবিতা ও ভাষাশৈলী আয়ত্ব করার জন্য তিনি বেদুঈন পল্লীতে চলে যান। দীর্ঘ দশ বছর হুযাইল কবিলাতে অবস্থান করে তিনি তাদের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গি এবং শিল্প-সাহিত্য আয়ত্ব করেন। হুযাইল গোত্র ছিল আরবদের মাঝে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী কবিলা। যার ফলে ইমাম শাফেয়ী অল্প বয়সে আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।

বিখ্যাত আরব্য সাহিত্যিক আসমায়ী’ বলেন, “আমি হুযাইল গোত্রের কবিতামালার ভুলগুলো শুধরে নিয়েছি কুরাইশদের এক বালকের কাছে। তার নাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস।” ইমাম শাফেয়ী মক্কার মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াতেন, আর মনোযোগ দিয়ে আলেমদের দরস (লেকচার) শুনতেন। খুব সংকটের মাঝে তিনি জীবন ধারণ করতেন। লেখার জন্য কাগজ কেনার পয়সা মিলতো না। তাই তিনি হাড্ডি, চীনামাটির পাত্র, সমান্তরাল যে কোনো কিছু সংগ্রহ করে সেগুলোর উপর লিখতেন। তিনি বলতেন, “অভাবের মাঝে যে ইল্‌ম তলব করে নাই সে ইল্‌ম অর্জনে সফল হবে না। আমি লেখার জন্য খাতা কেনার পয়সা পেতাম না।”

সে যুগের আলেম-ওলামা, ফিকহবিদরা মদীনার উদ্দেশ্যে সফর করত মদীনার প্রসিদ্ধ আলেম মালেক ইবন আনাসকে দেখার জন্য। মসজিদে নববীতে ইমাম মালেকের দরসের মজলিস ছিল। খলিফারাও সে মজলিসের কদর করতেন। ইমাম শাফেয়ীর কানেও ইমাম মালেকের খবর পৌঁছে। তিনি ইমাম মালেককে দেখার জন্য, তার ইলমের বাণী শুনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মালেকের মুয়াত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে সফর করেন। অনেক কষ্ট-ক্লেশের পর তিনি ইমাম মালেকের দরজায় পৌঁছতে সক্ষম হন। ইমাম মালেকের ফারাসা (অর্ন্তদৃষ্টি) ছিল। তিনি শাফেয়ীর দিকে একনজর তাকিয়ে বলেন, “মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ থেকে বেঁচে থাক। অচিরেই তোমার মহান মর্যাদা হবে।” অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, “আল্লাহ্ তোমার অন্তরে একটা নূর ঢেলে দিয়েছেন। গুনায় লিপ্ত হয়ে এ নূরকে নিভিয়ে ফেলো না।” এরপর বললেন, “আগামীকাল আস। যে ছাত্র কিতাব পড়বে এবং তুমি শুনবে সেও আগামীকাল আসবে।” শাফেয়ী বললেন, “আমি নিজেই পড়ব। এরপর আমি পুরা মুয়াত্তা মালেককে মুখস্থ শুনিয়েছি, কিতাব আমার হাতে ছিল। আমার পড়ার ধরন এবং ব্যাকরণিক নির্ভুলতা দেখে মালেক বেশ অভিভূত হন। মালেক বিরক্ত হন কিনা - এই ভয়ে যখনি আমি পড়া বন্ধ করতে চাইতাম তিনি বলতেন, এই ছেলে আরো পড়। তাই অতি অল্প দিনে সম্পূর্ণ মুয়াত্তা আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি। তিনি বলতেন, যদি কেউ সফলকাম হওয়ার থাকে, তাহলে সে হল এই ছেলেটি।” মুয়াত্তা পড়া শেষ করার পর তিনি মালেকের কাছে উক্ত কিতাবের আলোকে ফিকহ শিখতে থাকেন এবং মালেক রাহিমাহুল্লাহ যেসব মাসয়ালায় ফতোয়া দিতেন সেগুলো বুঝতে থাকেন। ওস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, “আমার কাছে এই ছেলের চেয়ে অধিক সমঝদার কোনো কুরাইশী ছেলে আসেনি।” আর শাফেয়ী বলতেন, “যদি আলেমদের কথা বলতে হয় তবে মালেক হচ্ছেন নক্ষত্রতুল্য। মালেক আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন।”

তার ইবাদত বন্দেগী ও আখলাক: তিনি ছিলেন অত্যধিক ইবাদতগুজার। রাত্রিকে তিনি তিনভাগে ভাগ করতেন। একভাগ ইল্‌মের জন্য, একভাগ ঘুমের জন্য, আর একভাগ ইবাদতের জন্য। তিনি তার রবের সামনে নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করতে থাকতেন; আর আমলে কসুরের ভয়ে তার চক্ষু অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে থাকত।” অতি বিনয়ের কারণে তিনি নিজেকে পাপী মনে করতেন। তিনি বলতেন,

“আমি সালেহীনদের (পূন্যবানদের) ভালবাসি; কিন্তু আমি পূন্যবান নই। এ আশায় যে আমি তাদের শাফায়াত পাব।

আমি তাদেরকে অপছন্দ করি যাদের সম্বল হল পাপ; যদিও সম্বলের দিক থেকে আমি এবং ওরা পরস্পর সমান।”

যিনি নিজের ব্যাপারে এই কথা বলেছেন লোকেরা তার ব্যাপারে বলেছে, “পূণ্যের পথ থেকে বিচ্যুতির সামান্যতম মোহ তার ব্যাপারে জানা যায়নি।”

আল্লাহ্ এই মহান আলেমকে তার খাস অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। এ কারণে তার কথার দারুন প্রভাব ছিল। তার কথা বের হত আলোকিত অন্তর থেকে। তাছাড়া নিরবিচ্ছন্ন ইবাদত ও আল্লাহ্র প্রতি তীব্র ভালোবাসা তার কথার প্রভাব ও আকর্ষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করেছিল। কুরআনের প্রতি ও এর সুহবতের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরক্ত। প্রতিদিন তিনি এক খতম কুরআন শরীফ পড়তেন। আর রমযানে দিনে এক খতম এবং রাতে এক খতম পড়তেন। যখন তিনি কুরআন পড়তেন তখন নিজেও কাঁদতেন এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতেন। তাঁর সময়কার জনৈক ব্যক্তি বলেন, “আমরা যখন কাঁদতে চাইতাম তখন একে অপরকে বলতাম: চল আমরা মুত্তালিবের বংশধর ঐ ছেলেটার কাছে গিয়ে কুরআন পড়ি। যখন আমরা তার কাছে আসতাম সে কুরআন পড়া শুরু করত। পড়ার এক পর্যায়ে মানুষ তার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত এবং কান্নার রোল পড়ে যেত। যখন সে এ অবস্থা দেখত তখন পড়া বন্ধ করে দিত।”

শরীয়তের বিধানের উপর তিনি এক পায়ে খাড়া থাকতেন। তিনি ছিলেন মহানুভব, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যেমনটি হয়ে থাকে রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধররা। তেমনি ছিলেন দানশীল। গরীব-মিসকীনকে এত অঢেল দান করতেন যেন তিনি অভাবকে কোনো তোয়াক্কা করতেন না। তার দানের ব্যাপারে অনেক বিস্ময়কর সব বর্ণনা রয়েছে।

তিনি বলতেন, “মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্তম্ভ চারটি। সৎচরিত্র, দানশীলতা, বিনয় এবং ইবাদত-বন্দেগী।” লাজুকতা ছিল তার বিশেষত্ব। এমনকি তার ব্যাপারে বলা হয় যে, যদি তার কাছে এমন কিছু চাওয়া হত যা তার কাছে নেই তখন লজ্জায় তার চেহারা লাল হয়ে যেত।

অগ্নি পরীক্ষা: ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে শিয়ামতবাদের প্রতি অনুরক্ততার অভিযোগ তোলা হয়। খলিফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে তাকে চক্রান্তকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে হারুন-অর-রশীদ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি ফরোয়ানা জারি করেন। আদেশ মতে তাকে এবং আরো নয়জন আলাওয়ীকে রশীদের কাছে ধরে আনা হয়। তখন তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। শাফেয়ীর সামনে আলাওয়ীদের নয়জনকে একের পর এক হত্যা করা হয়। এরপর আসে তার পালা। বিচারক ‘মুহাম্মদ ইবন হাসান’ হারুনের সামনে উপস্থিত ছিলেন। শাফেয়ী তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা দিয়ে খলিফার বিবেক ও মন ঝোঁকাতে পেরেছেন এবং তার নির্দোষত্ব তুলে ধরতে পেরেছেন। তখন খলিফা তাকে বিচারক মুহাম্মদ ইবন হাসানের কাছে সোপর্দ করেন। আলেমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হওয়াই স্বাভাবিক। বিচারক তার পক্ষে কথা বলেন এবং খালাস পেতে সহযোগিতা করেন। বিচারক বলেন, “তার ইলমী মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তার ব্যাপারে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয়।” এভাবে তিনি অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। উপরন্তু খলিফা তার জন্য পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা উপঢৌকন হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। শাফেয়ী খলিফার কাছ থেকে এ উপঢৌকন গ্রহণ করে আবার তার সদর দরজাতেই তা বিতরণ করে দেন।

অসুস্থতা ও মৃত্যু: শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ অনেক রোগ-ব্যাধিতে ভুগতেন। বিশেষত অর্শ্বরোগে। তার শেষ জীবনে এ রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি কোনো বাহনে চড়লে হয়তো পরক্ষণেই রক্তপাত শুরু হত। তার বসার বিছানার উপর একটা মোটা নরম কাপড়ের পট্টি থাকত। রক্ত পড়লে এ কাপড়টি চুষে নিত। তিনি রোগ নিয়ে যে কষ্ট করেছেন এমন কষ্ট আর কেউ করেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু রোগব্যাধি তাকে পাঠদান, গবেষণাকর্ম ও পড়াশুনা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তার মত মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটি অবাস্তব কিছু নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- কোন লোকেরা সবচেয়ে বেশী বিপদাপদের

মুখোমুখি হোন? তিনি বলেন, “নবীরা, তারপর তাদের নিকটবর্তী মর্যাদার অধিকারীরা, তারপর তাদের নিকটবর্তী মর্যাদার অধিকারীরা”[2] তার মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তার ছাত্র মুযানি তার সাথে দেখা করতে যান। তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন আজ সকালে আপনার কেমন লাগছে? তখন তিনি বলেন, “আজ আমি দুনিয়াকে বিদায় জানাচ্ছি, বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে যাচ্ছি, মৃত্যুর সুধা পান করছি, আল্লাহ্‌র পানে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি না আমার রূহ কি জান্নাতের পথযাত্রী, যার ফলে আমি তাকে অভিবাদন জানাব; নাকি জাহান্নামের পথযাত্রী যার ফলে আমি তার জন্য শোক করব। এরপর কেঁদে দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বলেন-

“আমার আত্মা কঠিন হয়ে পড়ল, সব রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে এল। এখন আপনার ক্ষমা আমার জন্য আশার সোপান।

আমার গুনাহ্‌ অনেক বেশী, অনেক বড়; কিন্তু যখন আমি আমার গুনাহকে আপনার ক্ষমার সাথে তুলনা করি তখন দেখি আপনার ক্ষমাই বড়।

আপনি তো ক্ষমা করে যাচ্ছেন, উদারতা দেখিয়ে যাচ্ছেন; ক্ষমা করাটা আপনার একান্ত অনুগ্রহ, নিরেট অনুকম্পা।”

২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ রাত্রে চুয়ান্ন বছর বয়সে তার রূহ তার রবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

এর পরের দিন আসরের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহকে মিসরের “কারাফা” নামক স্থানে তার অন্তিম শয্যার দিকে বহন করে নিয়ে যায়। শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুতে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। আলেমদের চেহারায় শোকের কালিমা ফুটে উঠে। তার ছাত্রদের ডানা ভেঙ্গে যায়। আমাদের উজ্জ্বল ইতিহাসের একটি পাতা ঝরে পড়ে। মানবাকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয়ে পূর্বপশ্চিম দিগন্ত আলোকিত করেছিল তা অস্তমিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা‘আলা শাফেয়ীর প্রতি রহম করুন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তার অন্তিম শয্যা উত্তম করুন। তার ব্যাপারে ইমাম আহমদ যে মন্তব্য করেছেন তিনি বাস্তবে তেমনি ছিলেন। ইমাম আহমদ বলেন, “শাফেয়ী ছিলেন দুনিয়ার জন্য সূর্য যেমন, দেহের জন্য সুস্থতা যেমন। দেখ এ দুটির কোনো উত্তরসূরী আছে কি অথবা এ দুটির কোনো বিকল্প আছে কি?”

>

ফুটনোট

* মুহাম্মদ আবু যুহরার “আশ শাফেয়ী” এবং “হাশিয়াতুল বুজাইরামী” শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ের সহযোগিতা নিয়ে জীবনীটি লেখা হয়েছে।

[1] ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উপাধি।

[2] ইমাম তিরমিজী তার জামে’ গ্রন্থে সাদ ইবন আবি ওক্কাস (রাঃ) এর সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হা. নং (২৩৯৮)

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন